শাহরুখের স্বপ্নের বাংলো কি নীলাম হয়ে যাচ্ছে?

১০ টাকা

আনন্দলোক

সিনেমা থেকে বিনোদন

২২ মে ২০০১

- বলিউডের ড্রাগ চক্রান্তে ফরদিন
- কেমন বৌদি অপর্ণা সেন?
- মীনাকুমারী, সুচিত্রা সেন, ইন্দিরা গাঁধী ও গুলজার

বড়কর্তা ছোটকর্তা

পিতাপুত্র না প্রতিদ্বন্দ্বী?

আনন্দলোক

২৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২২ মে ২০০১

অন্যান্য

বিভাগ

প্রচ্ছদ : শচীন দেববর্মন এবং রাহুল দেববর্মন।

সম্পাদক
ঋতুপর্ণ ঘোষ
এবিপি লিমিটেড এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
ANANDALOK is Published fortnightly by ABP Ltd. 6. Prafulla Sarkar Street Calcutta-700001
Export this magazine to the United States through our authorised agent only.

ছোটকর্তা রাহুল দেববর্মন

বচ্চে তো বচ্চে, বাপরে বাপ
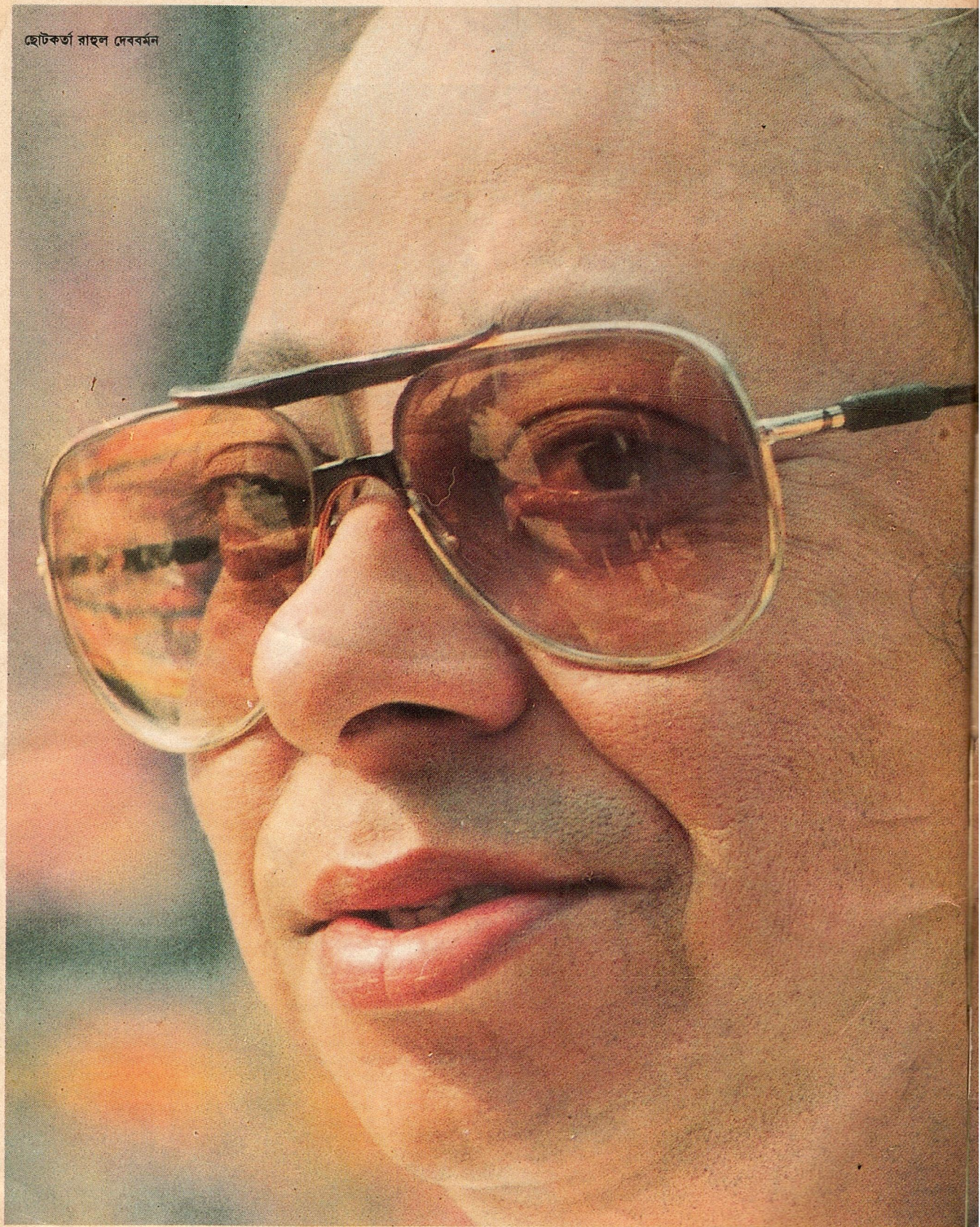
শচীন ও রাহুল দেববর্মনকে নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব কেন? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উঠেছে সঙ্গত কারণে। বর্তমান প্রজন্মও দোলাচলে, কে বেশি প্রতিভাবান। বড়কর্তা না ছোটকর্তা? কারণ, যতই আধুনিকতার হাওয়া লাগুক, সুর তো সেই 'সা' থেকে 'সা'। লিখছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

বান্দ্রার পশ্চিমপ্রান্তে শচীনকর্তার বাড়িতে এক সকালে সদলবলে হাজির শক্তি সামন্ত। মাসকয়েক আগেই মুক্তি পেয়েছে এই পরিচালকের *'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস'*। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে লতায়পাতায় যুক্ত শর্মিলা ঠাকুরের বিকিনি পরার দৌলতে যে ছবি 'হট', 'হিট' দুইই। শচীনকর্তার কাছে শক্তির আর্জি, আপনাকে আমার আগামী ছবিতে সুর করতে হবে। এমনিতেই বাদরাগী, খিটখিটে মানুষ শচীন দেব বর্মণ। তার ওপর বিলক্ষণ জানেন, আগের ছবি *'অ্যান ইভনিং......'*-এর গান সুপার-ডুপার হিট। তাহলে মতলবটা কী? ঝেড়ে কাসলেন শক্তি। জানালেন, বড় ছবি করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু যা বাজেট মিলছে তাতে আপাতত ছোটমাপের একটি ছবি করতে চান। আগের ছবির সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণের যা টাকার খাঁই,

বড়কর্তা শচীন দেববর্মন
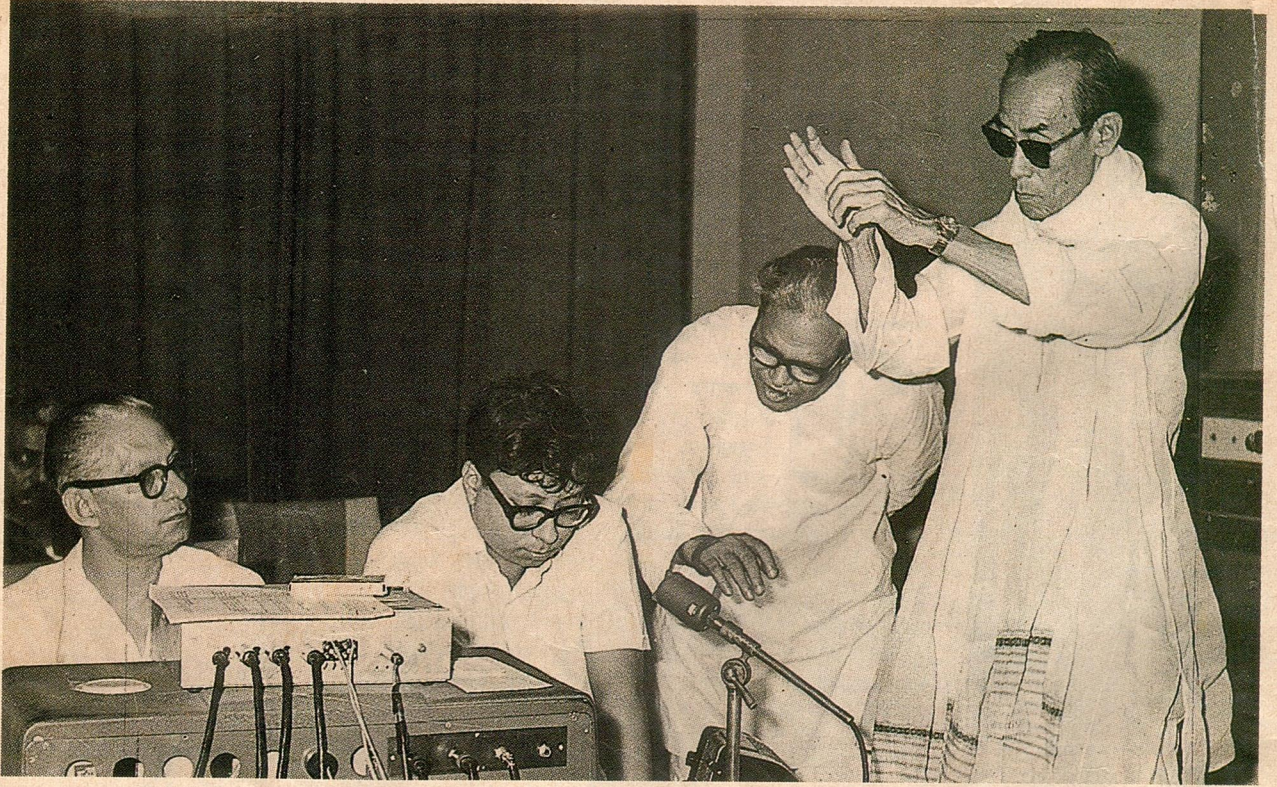
রেকডিং-এ সাউন্ড রেকর্ডিস্ট রবীন চট্টোপাধ্যায়, রাহুল, মজরু সুলতানপুরী এবং শচীনকর্তা

এস ডি বুঝতে পেরেছিলেন, এ ছেলেকে তাঁর সহকারী করে রেখে লাভ নেই। তার চেয়েও বড় সত্যি এটাই, যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারে তাঁর মেজাজের বিপরীতে হাঁটে পঞ্চম।

তাতে দরে পোষাবে না, অগত্যা...। খুব যে সম্মানজনক প্রস্তাব এমন নয়। অন্যসময় হলে খাঁটি বাঙাল ভাষায় গালি দিয়ে ভাগিয়ে দিতেন, কিন্তু শচীনকর্তার মতিগতি বোঝা ভার। নিয়ে নিলেন ছবিটা। ছবির নাম ঠিক হয়েছে *'সুবহ প্যার কি।' ইভনিং ইন প্যারিসে* লতার সুপারহিট *'রাত কে হামসফর থক কে ঘরকো চলে/ ঝুমতি আ রহি হ্যায় সুবহ প্যার কি'*— গান থেকে নেওয়া। পয়সাকড়ি নিয়ে এমনিতে মুখ খোলেন না রাজপরিবারজাত সুরকার। সেদিন বলে বসলেন, বাজেট যাই হোক আমার কিন্তু ৭৫ হাজারই লাগবে। বিনীতস্বরে মিনমিন করে শক্তি সামন্তর নিবেদন, ইয়ে মানে আমরা এক লাখ ধরেছি।

শুরু হয়ে গেল *'সুবহ প্যার কি'*র কাজ। সুর ঝাড়াই বাছাই হল, পঞ্চমের তত্ত্বাবধানে অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজও চালু হল জোরকদমে, এসময় শক্তি সামন্ত'র বন্ধুবর, এ ছবির গল্পকার শচীন ভৌমিক পাল্টে দিলেন ছবির নাম। ঠিক হল বাংলা-হিন্দি দুটো ভার্সানে তোলা হবে ছবিটি। নাম ঠিক হল শচীন দেববর্মণের একটি গান থেকেই। *'আরাধনা।'*

বাকি গল্পটুকু মোটামুটিভাবে সবার জানা। এই সেই মাইলস্টোন, যে ছবিতে স্টার থেকে সুপারস্টার বনে গেলেন রাজেশ খন্না, রেটিং-এ গত ২০ বছর পিছনে থাকা কিশোর একলাফে টপকে গেলেন মহম্মদ রফিকে। আর হিন্দি ছবির সুরের ম্যারাথন দৌড়ে একবারে লাস্টল্যাপে শঙ্কর জয়কিষণকে মেরে দিলেন শচীন দেববর্মন। শেষ ঘটনাটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? গুরুত্বপূর্ণ কেননা মুম্বাইয়া 'বিগব্যান্ড' মিউজিকের সঙ্গে শচীনকর্তার সহজ মধুর লোকগান নির্ভর সুরের লড়াই দীর্ঘদিনের। যে সাঙ্গীতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে মুম্বই আসেন শচীন দেববর্মন, তা যে 'ব্যাকডেটেড' হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, বারেবারেই তাঁর মনে হত একথা। তাঁর সুর মাটির কাছের, নিখাদ দিশি। ধ্রুপদী গানে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত কিন্তু তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে 'মস্করা' তিনি করেননি কখনও, পাশ্চাত্যসঙ্গীতও প্রায় গো-মাংসের মতই পরিত্যাজ্য তাঁর কাছে। শঙ্কর-জয়কিষণ, ওপি নাইয়ার, মদনমোহনের মত বিগব্যান্ড স্কোর-এর বিরুদ্ধে তিনি লড়ে যাচ্ছিলেন শুধুমাত্র মেলোডি আর নিজের প্রতিভা সম্বল করে। আর এই জায়গাটাতেই *আরাধনায়* জিতে গেলেন তিনি। যে কিশোরকণ্ঠকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যাঁকে নেওয়া নিয়ে কিছু কম কথা শুনতে হয়নি তাঁকে, সেই কিশোর তাঁরই হাত ধরে হিন্দি গানে এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। ১৯৬৯ তে।

যে মানুষটি গত ২০-২৫ বছর ধরে এক সুনির্দিষ্ট ধারার সুর করে এসেছেন, কেমন করে সেই ৬৩ বছরের বৃদ্ধ আরাধনায় বদলে ফেললেন নিজেকে? *'গাইড'*-এর *'আজ ফির জিনে কি তমান্না হ্যায়'*-এর সঙ্গে *'মেরে সপনো কা রানী'*র তফাৎ যে অনেকটা। তফাতটা গানের 'টিউন'-এ নয়, মিউজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টে। এতো স্পষ্ট গোমাংসের গন্ধ। তাহলে এই কীর্তিটি কার? কার আবার! ছোটকর্তা মানে পঞ্চমের, মানে আর ডি বর্মণের। মুম্বইয়ের সঙ্গীতবিশেষজ্ঞদের মতে, *আরাধনার* আবহে যেমন মাঝেমধ্যেই রাহুলের গলা পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই গানগুলির আবহেও বড় বেশি রয়েছেন আর ডি। একধাপ এগিয়ে অনেকে এমনও বলেছেন, *মেরে সপনো কা রানীর* যে হারমোনিকা পিস নিয়ে এত হইচই, সেটিরও খসড়া নাকি পঞ্চমের হাতে তৈরি। বড়কর্তা চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মত জ্বলে উঠছেন আর ছোটকর্তা হিন্দি গান কে দিতে চলেছেন এক নতুন দিশা, এই যুগলবন্দিতে *আরাধনার* সাতটি গান যে সাতকাণ্ড

রচনা করবে এতে আর আশ্চর্য কী?

কীভাবে কাজ করেছেন পঞ্চম? যে দৃশ্যটিতে উন্মুক্ত রাজেশ-শর্মিলা তিরতির করে কাঁপছেন, এস ডি তাঁদের লিপে কম্পোজ করলেন এমন এক গান, পছন্দ হল না সহকারী পঞ্চম বা গায়ক কিশোরের। ধুস্, প্যাশনই নেই গানে। তাই পঞ্চম বাবারই একটি পুরনো সুর নিয়ে বানালেন নতুন সুর। বাবার গানটি ছিল *'কালকে যাব শ্বশুরবাড়ি'* অ্যাফ্রো-তাল 'চাচা'র ছন্দে অন্য মাত্রা পেল নতুন গানটি। কিন্তু এবার বিড়ালের গলায় ঘন্টাটি বাঁধবে কে? কিশোর না পঞ্চম! শেষমেশ পঞ্চমই গিয়ে বাবাকে বলে নতুন গানটির কথা। *'রূপ তেরা মাস্তানা'* শুনে এস ডি বুঝতে পেরেছিলেন, এ ছেলেকে তাঁর সহকারী করে রেখে লাভ নেই। তার চেয়েও বড় সত্যি এটাই, যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারে তাঁর মেজাজের বিপরীতে হাঁটে পঞ্চম। সে পথ শচীনকর্তার নয়। কিন্তু সে পথই নতুন যুগের বিপণনের পথ। সাঙ্গীতিক আদর্শের দিক থেকে বাবা-ছেলের সংঘাত শুরু এখানেই। বড়কর্তার শেষ ছবিগুলিতে তাঁর প্রধান সহকারী পরিচালক পঞ্চম নন, তাঁর স্ত্রী মীরা দেববর্মণ! এস ডি *আরাধনায়* পেলেন অনেক কিছু, আর হারালেন পঞ্চমকে।

বড়কর্তার ঠিকুজি

ত্রিপুরায় শতাব্দীর প্রবন্ধচর্চায় (সম্পাদক ও লেখক রমাপ্রসাদ দত্ত) পাওয়া যাচ্ছে, "ঈশাণচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। নবদ্বীপের পিতৃব্য বীরচন্দ্র তাঁকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে নিজেই সিংহাসনে বসেছেন।" এই নবদ্বীপচন্দ্রেরই পুত্র শচীন দেববর্মণ, আগরতলা রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরসূরী। জন্ম ১৯০৬-এর ১ অক্টোবর বাংলাদেশের কুমিল্লায়। বেড়ে উঠেছেন আগরতলার চোখ জুড়ানো সবুজের মধ্যে। দুচোখ ভরে দেখেছেন প্রকৃতির অকৃপণ চেহারে আর প্রাণ ভরে শুনেছেন পল্লীর গান হয়ত তখনই খুঁজে পেয়েছিলেন *'সুজন নাইয়া'* বা *'শুনো মেরে বন্ধুরে'*-র সুর। এমন সুরের সন্ধান পান যে রসিক, বাবা চাইলেই কি আর বিদেশে পাঠাতে পারে তাঁকে! গানের জগতেই তিনি থাকবেন, বাবাকে স্পষ্ট করে একথা বুঝিয়ে কলকাতায় চলে এলেন শচীন। ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা শুরু করলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ওস্তাদ বাদল খান সাহেবের কাছে। যোগাযোগ ছিল আলাউদ্দিন খাঁ, ফৈজ খাঁর সঙ্গেও। কৃষ্ণচন্দ্র দের (যিনি কানাকেষ্ট নামেই পরিচিত) সঙ্গে মান-অভিমানের এক অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল এস ডি'র। পরবর্তী একটা পর্যায়ে দুজনে দুজনের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না। কিন্তু কানাকেষ্টর ভাইপো মান্না দে'র মত আনকোরা গায়ককে দিয়ে গান গাওয়াতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা ছিল না কখনও।

কলকাতায় এস ডি'র বাসা ছিল ৩৬/১ সাউথ এন্ড পার্কে। সেসময় কেমন জীবনযাত্রা ছিল সিংহাসন হারানো রাজকুমারের? না লম্বা—না বেঁটে। ফর্সা, মেদহীন এস ডি চিরকালই অমন দড়ি পাকানো চেহারার, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলত সিল্কের শার্ট, তার হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো, দামি বিলিতি কাপড় জলকোঁচা মেরে পরা, পায়ে লাল শুঁড়তোলা চটি। এমন পরিধান রাজকীয় না হতে পারে কিন্তু তাঁর মেজাজ ছিল সব অর্থেই রাজকীয়। প্রকাশ্য

শচীন দেববর্মন ও মীরা দেববর্মন

বড়কর্তার নিজের গাওয়া বাংলা সিনেমার গান

অভয়ের বিয়ে	আয়ে দিল বেতাব উসে ইয়াদ কিয়ে যা (৪২)
ছদ্মবেশী	বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সব জোয়ার এসেছে আজ (৪৩)
মতির ঘর	★ শ্যামরূপ ধরে এসেছে মরণ ★ কালসাগরের মরণদোলায় (৪৩)
নন্দিনী	চোখ গেল চোখ গেল
সেলিমা	পরিচালক মধু বসুর ছবিতে গান গেয়েছিলেন ১৯৩৫-এ
এপার ওপার	বিদেশিরে উদাসীরে ফিরে তুমি যাও (৪০)
নারী	কে যেন কান্দিছে আকাশভুবনময় (৪২)
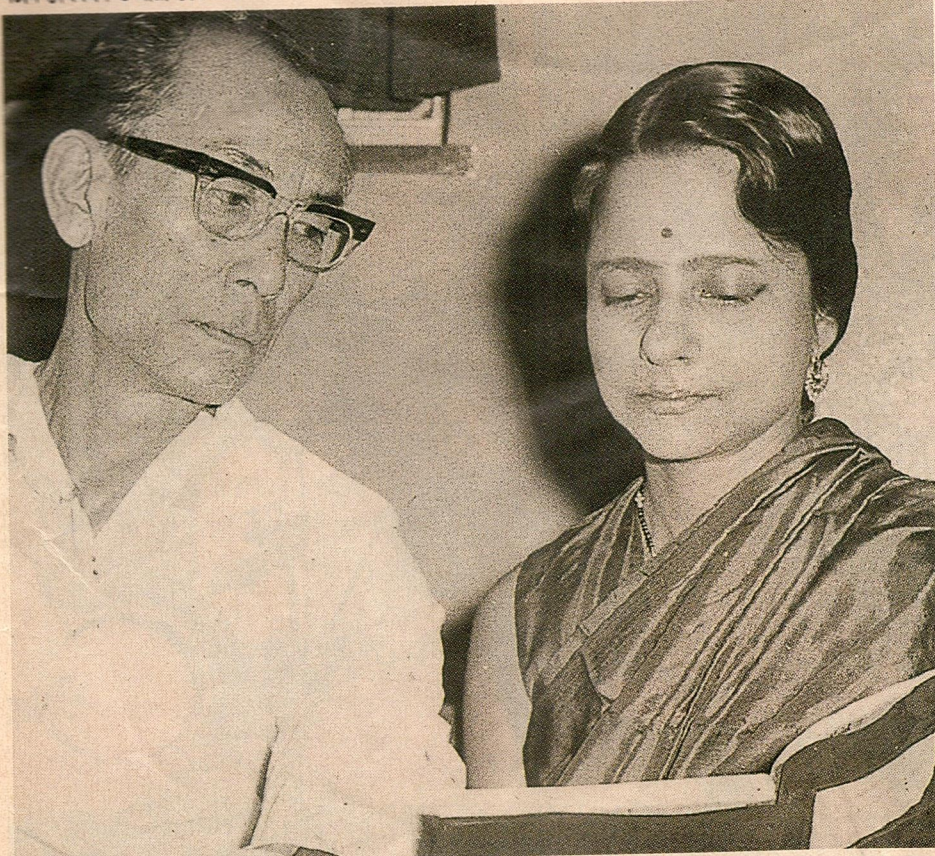
অসুবিধে শুনেই এস ডি জয়দেবকে বলে দিতে বলেন, দরকার নেই তাঁকে। এই অভিমানপর্বে অবশ্য ভয়ানক লাভ হয়েছিল আশা ভোঁসলের।

আসরে খুব একটা গান করেননি। রোজ সকাল বিকেলে বৈঠকখানায় বসে গলা ভাঁজতেন। কলকাতায় তাই শুনতে লোকের ভিড় হত। এসময় তিনি তৈরি করছেন তাঁর রাগাশ্রিত বাংলা গানগুলি। পরবর্তী সময়ে এই সব গান হিন্দি গানের জগতকেও দিয়েছে অনেক।

গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে সামান্য খিটিমিটি বাঁধায় বদমেজাজি এস ডি'র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত, *হিন্দুস্তান রেকর্ডস* কোম্পানি থেকে বার হবে প্রথম বাংলা গান। শচীনকর্তার নিজের সুরে বার হওয়া দুটি গান *'এই পথে আজ এসো প্রিয়া'* ও *'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানের পরে'* একের পর এক রাগাশ্রয়ী বাংলা গানে তখন ভেসে আকুল বাঙালি শ্রোতৃকুল; *আলো ছায়া দোলা, আমি ছিনু একা, মধু বৃন্দাবনে, কুহু কুহু কোয়েলিয়া,*— কোনটা ছেড়ে কোনটা শুনবে সেটা ঠাহর করতে পারার আগেই বড়কর্তা সটান পাড়ি দিলেন মুম্বই। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্যও আঁচ করতে পারেননি এই চলে যাওয়া। আসলে ছোট থেকেই শিকড়হীন শচীন দেববর্মন খুঁজে বেড়িয়েছেন সেই সিংহাসন, সেই স্বীকৃতি যা আরও অনেক, অনেক বেশি উঁচু। প্রতিভাধর হিসাবে মুম্বইতেও এস ডি'র পরিচিতি ছিল যথেষ্ট। প্রথম দুটি ছবি *'শিকারী', 'আটদিন'* (১৯৪৬) পেতে অসুবিধে হয়নি কোনও। হিন্দি ছবির প্রথম দিকের যেসব সুরকাররা ছিলেন তা সে নৌশাদ, শ্রীরামচন্দ্র থেকে অনিল বিশ্বাস, সাজ্জাদ হোসেন পর্যন্ত কেউই ফিল্ম মিউজিক ব্যাপারটায় ধাতস্থ হতে পারেননি। মেলোডি লাইনের বাইরে ভাবতে পারেননি আর কিছু।

এস ডি এসেই সব পাল্টালেন। রকমারি তালের ব্যবহার, যন্ত্রানুষঙ্গের মাপমত প্রয়োগ অন্যদের চেয়ে অনেকটা আলাদা করে দিল তাঁকে। এরপর *'চিতোর বিজয়', 'দিল কি রানী', 'দোভাই'* (১৯৪৭) থেকে ১৯৭৫-এর *'চুপকে চুপকে', 'মিলি'* পর্যন্ত এক লম্বা দৌড়। মাঝেমাঝেই ক্লান্ত এস ডি ফিরে আসতে চেয়েছেন কলকাতায়। এ শহরের তিনি যেন এক আজন্ম নাগরিক। কট্টর সমর্থক ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের। এস ডি'র দলের বাজনদার মনোহারি সিং জানিয়েছেন, একবার দাদা রেগে গিয়ে তাঁদের বলেন, রোজ রেকর্ডিং-এ ঢোকার আগে একঘন্টা ফুটবল খেলবে। এছাড়া মুম্বইয়ের মিউজিক সার্কেলে এটা চালু রসিকতা ছিল, মাঠে দাদার দলকে সমর্থন করলে স্টুডিওতে ঢোকার গেটপাস মিলবে।

কিশোরকুমার এই কাজটা করেছিলেন কিনা কে জানে, তবে তিনি এস ডি'র একটি গান হুবহু তাঁর মত করেই শুনিয়েছিলেন। সেই যে কিশোরকে ভাল লেগে গেল বড়কর্তার, এরপর থেকে অধিকাংশ ভাল গানই তাঁকে দিয়ে গাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন এস ডি। *'জীবন কে সফর মে রাহি'* (মুনিমজি), *'ছোড় দো আঁচল'* (পেইং গেস্ট) *'ইয়ে দিল না হোতা বেচারা'* (জুয়েল থিপ), *'গাতা রহে মেরা দিল'* (গাইড)—এমন আরও অনেক গানেই সেই প্রশ্রয়ের ছাপ। *'ফান্টুস'*-এ *'দুখী মন মেরে'* গানটি কিশোরকে দেওয়া নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি। জেদ বজায় রেখে জিতেছেন শেষমেশ এস ডি'ই। এই জেদের কারণেই ১৯৫৭ থেকে ৬২—দীর্ঘ ৬ বছর লতাকে দিয়ে গান করাননি। *'সিতারো কি আগে'* সিনেমার রেকর্ডিং-এর একটি গান এস ডি'র পছন্দ না হওয়ার পরে আবার

ফাংশানে শচীনকর্তা, পেছনে মান্না দে
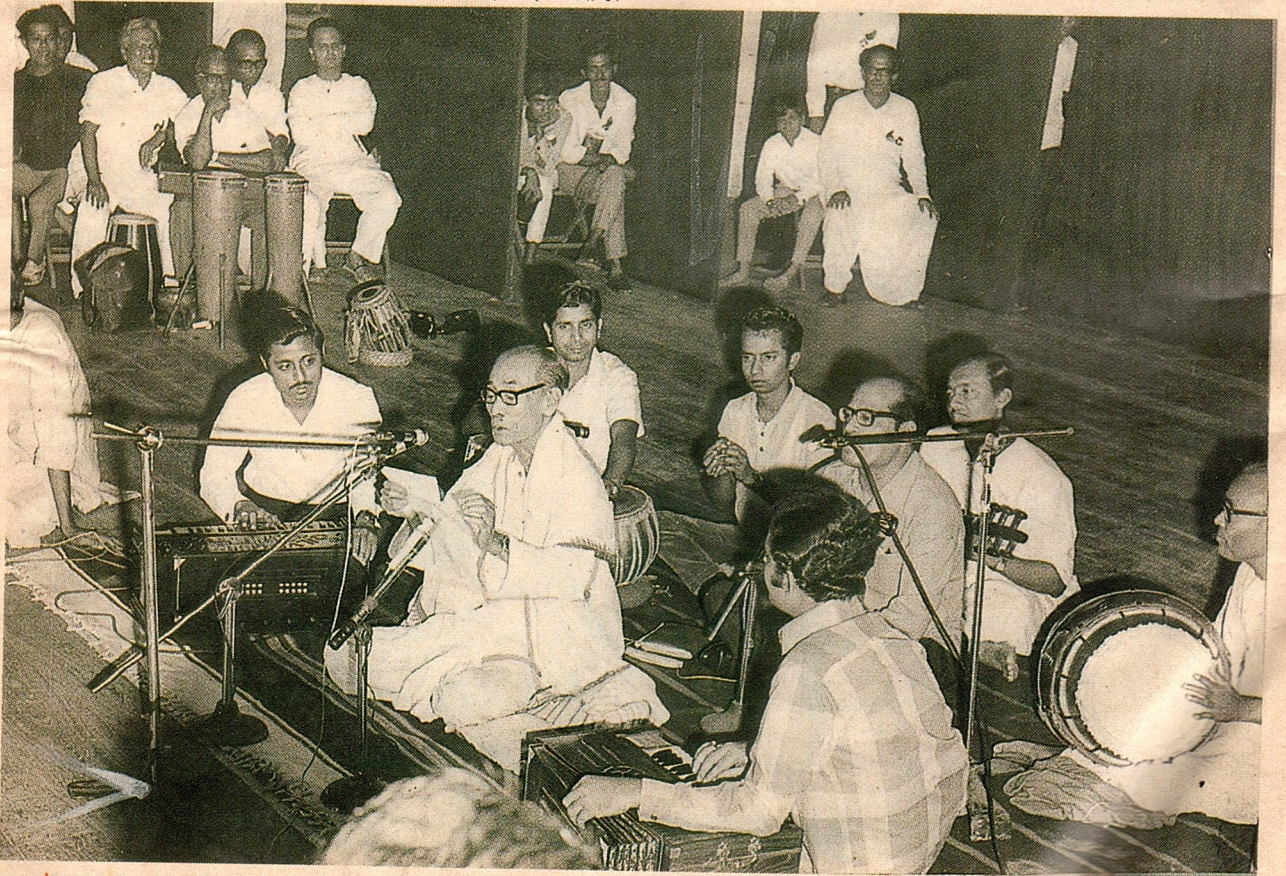
দুই কর্তার রবিঠাকুর

কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেননি। যেসময় শচীনকর্তা কলকাতায়, তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোর দূরত্ব এমন কিছু বেশি ছিল না। আসলে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল অন্য একটা জায়গায়। বাবা নবদ্বীপচন্দ্র যে পিতৃব্যর হাতে বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন, ত্রিপুরার রাজা সেই বীরচন্দ্রের আতিথ্য বহুবার গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই অভিমানের জায়গা থেকেই কখনও গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করেননি শচীন দেববর্মণ। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন নজরুল, একসঙ্গে বসে গানও তৈরি করেছেন দু'জনে কিন্তু গুরুদেব দর্শনে তাঁর অনীহা ছিল প্রবল। তার মানে কিন্তু এই নয় রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসতেন না এস ডি। স্ত্রী মীরা দেববর্মণ ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী, এস ডি নিজেও জানতেন অধিকাংশ রবীন্দ্রসঙ্গীত। হিন্দি গানে সুর করার সময় রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহারও করেছেন অক্লেশে। *'ট্যাক্সি ড্রাইভার'* ছবির বিখ্যাত গান *'যায়ে তো যায়ে কাহা'* গানটি অনেকটাই *'হে ক্ষণিকের অতিথি'*র সুর অনুসারী। পরবর্তীকালে এস ডি'র শেষদিকের ছবি *'অভিমান'*-এও *'তেরে মেরে মিলন কি'*র মূল সুরটি তিনি নিয়েছিলেন *'যদি তারে নাই চিনি গো সেকি'* থেকে। বন্ধু নজরুলের গান *'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি'* গানটির সুরও তিনি নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন *'মেরি সুরত তেরি আঁখে'* ছবিতে। মান্না দে'র গলায় *'পুছোনা ক্যায়সে ম্যায়নে'* এক অনবদ্য সংযোজন। শুধু বড়কর্তাই নন, বিজন মুহূর্তগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন ছোটকর্তা পঞ্চমও। *'তোমার হল শুরু'* ভেঙে *'ছুকর মেরে মনকো'* বানিয়েছিলেন, জড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিতর্কেও।

আরবসাগরের তীরের উত্তাল জীবন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, সাফল্য-ব্যর্থতার পাশে দুই অভিমানী সুরকারেরই শান্তির আশ্রয় ছিল রবীন্দ্রনাথের গান।

সেটিকে রেকর্ড করতে বলেন। সেসময় লতার ডেট নেই, বিদেশেও চলে যাওয়ার কথা। তখন এস ডি'র সহকারী, পরবর্তীকালে নামজাদা সঙ্গীত পরিচালক জয়দেব লতাকে ফোন করেন। লতার অসুবিধে শুনেই এস ডি জয়দেবকে বলে দিতে বলেন, দরকার নেই তাকে। এই অভিমানপর্বে অবশ্য ভয়ানক লাভ হয়েছিল আশা ভোঁসলের। *'চলতি কা নাম গাড়ি', 'কাগজ কা ফুল', 'সুজাতা', 'বোম্বাই কা বাবু', 'কালাবাজার', 'মঞ্জিল'*—এই সময়ের সব ছবিতে শুধুই আশা। ১৯৫১-র পর গীতা দত্ত'র দুঃখী গানের ইমেজ ভেঙে *'বাজি', 'পিয়াসা', 'সুজাতা'*য় যেমন ভারতীয় সিনেমা খুঁজে পেয়েছিল 'সেক্স অ্যাপিল পূর্ণ' এক সতেজ কণ্ঠ, শচীনকর্তার হাতে পড়ে গীতা দত্তের সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে এখানেও দাঁড়িয়ে গেলেন আশা। ৬৩'র *'বন্দিনী'* থেকে আবার ফিরে আসেন লতা, বড়কর্তার নিজস্ব উচ্চারণে 'লোতা'। টেনিসপ্রিয় শচীন দেববর্মন রসিকতা করে বলতেন, আমার প্রথম সার্ভ লতা। আর সেকেন্ড সার্ভ আশা।

আসলে একটা আদর্শ বুকে নিয়ে মুম্বইয়ের ফিল্মজগতে পা রেখেছিলেন শচীনকর্তা। কম কাজ অথচ ভাল কাজ—এই ছিল তাঁর সাফ নীতি। লতা মঙ্গেশকর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যদি মাসের ২৫ তারিখে কোনও রেকর্ডিং রাখতেন দাদা, তো মাসের ৫—১০ তারিখ থেকেই ফোন করতেন ঘনঘন। শুনতেন গায়ক বা গায়িকার গলার অবস্থা। বুঝুন!

দেব আনন্দ যখন তাঁকে বাদ দিয়ে *'হরেরামা হরে কৃষ্ণ'*য় আর ডি কে নিলেন তখন কষ্ট পাননি। কষ্ট পেলেন যেদিন স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে শুনলেন *'দম মারো দম'!* তাঁরই পুত্র পঞ্চম, তাঁরই মত প্রতিভাবান, তাঁরই রাজঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, তবু কোথায় যেন আলাদা, কোথায় যেন তাঁকে অস্বীকার করার প্রাণপণ চেষ্টা। পঞ্চম দেখলেন, স্টুডিও থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন বাবা। হাঁটাচলায় দৃপ্তভঙ্গি অদৃশ্য, নুয়ে পড়া চেহারা, যেন এক পরাজিত রাজপুত্র ফিরে যাচ্ছেন।

ছোটকর্তার কুলুজি

রাহুলের বয়স তখন ১৩। বাবার কাছে মাঝেমধ্যেই আবদার করেন সুর দেবেন বলে আর ধমক খান। নিত্যনৈমিত্তিক এমন চলার ফাঁকে দেব আনন্দের *'ফান্টুস'* ছবিটি দেখে রাহুলের চক্ষু চড়কগাছ। *'অ্যায় মেরি টোপি পলট কে আনা আপনে ফান্টুস কো সতা'* গানটির সুর আসলে তারই। বাবাকে কোনও এক সময় শুনিয়েছিলেন। উত্তেজিত ছোটকর্তা যখন জানতে চাইলেন প্রকৃত কারণ, ভাবলেশহীন মুখে বড়কর্তার জবাব, হ্যাঁ আমি জানি ওটা তোমার সুর। শচীন দেববর্মণ নিজে বেছেছেন এই সুর, তোমার গর্বিত হওয়া উচিত। বাবা যে শুধু বাবাই নন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সুরকারও। ব্যাস এই টেনশন শুরু হয়ে গেল কিশোর রাহুলের মনে।

তুল্যমূল্য বিচারটা

দু'জন দু'রকম শক্তি সামন্ত

দুজন দুরকম ট্যালেন্টেড। কে বেশি কে কম এভাবে না বলে আমি বলব দুজনে তাঁদের নিজেদের প্রতিভা নিয়েই জন্মেছেন। দুজনেরই সহজাত প্রতিভা ছিল। শচীনদাকে নিয়েও আমি যেমন কাজ করেছি তেমনই পঞ্চমকে নিয়েও কাজ করেছি। শচীনদার সুরে ছিল মাটির টান। শচীনদার সুরের মধ্যে লোকগীতির প্রভাব বেশি। ফোক নিয়ে শচীনদার চিন্তাভাবনা বা তাকে আধুনিক গানের মতো করে তোলা, তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অন্যদিকে পঞ্চম ওয়েস্টার্ন সুরকে এমনভাবে ইন্ডিয়ানাইজ করল যে সে ব্যাপারে তার তুলনা সে নিজেই। আমার 'আরাধনা' ছবির সময় শচীনদাই ছিলেন মিউজিক ডিরেক্টর। সেখানে পঞ্চম ছিল শচীনদার সহকারী। ছেলে হিসেবে বাবার প্রভাব একেবারে মুক্ত থাকাটাও তো অস্বাভাবিক, তাই বাবার ভাল কিছু জিনিস নিয়ে পঞ্চম নাড়াচাড়া করে তাকে একটা নতুনতর মাত্রায় নিয়ে গেছে।

সন্দেশ ভাল না রসগোল্লা

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়

এটা কেমন টপিক হল? সন্দেশ ভাল না রসগোল্লা ভাল একথা যদি কোনও বাঙালিকে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে যা দাঁড়াবে, এটাও সেরকম প্রশ্ন হয়ে গেল। আমার সঙ্গে শচীনকর্তা চার কি পাঁচটা ছবিতে কাজ করেছেন। পঞ্চম কাজ করেছে ১১টা কি ১২টা ছবিতে। দুজনকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি দুজনেই নিজস্ব ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে ট্যালেন্টেড। শচীনদা ছিলেন ক্ষণজন্মা। আর পঞ্চম জিনিয়াস। অসম্ভব ট্যালেন্টেড। যোগ্য বাবার যথাযোগ্য ছেলে। বাবার সব গুণগুলো নিজে তো পেয়েছিল পঞ্চম, তাকে আবার নতুন পরীক্ষায় নতুন করে তুলত। এবার বাকিটা আপনারা বুঝে নিন।

ওঁদের তুলনা ওঁরা নিজেই

দেবআনন্দ

শচীনদা ওয়াজ আ জিনিয়াস। ওরকম সুরের সমারোহ নিয়ে এর আগে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ এসেছিলেন কিনা মনে করতে পারছি না। শচীনদা এক সময় আমাদের ব্যানারেরই একজন প্রধান মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের কেরিয়ারের মধ্য গগনের ছবিগুলোয় শচীনদার সুরারোপ আমাদের ছবিগুলোরই অন্য এক আকর্ষণ এনে দিত একথা আজ স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই। আর পঞ্চমের সঙ্গে পরিচয় তো কতদিনের! শচীনদার সঙ্গে কাজ করত। বাবার যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু নিজের শক্তির পরিচয় নিজে বুঝেছিল বলেই ও বেরিয়ে এল। তার পর আমার ছবিগুলোতেই যে অসাধারণ সুর করেছে সেগুলো আজ ইতিহাস। দুজনেই ইউনিক। শুধু আমি নয়, ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যে কেউ স্বীকার করবে একথা। ওঁদের তুলনা একে অপরের সঙ্গে নয়, ওঁদের তুলনা ওঁরা নিজেই।

??? * ERROR : IT WAS RAJESH ROSHAN

একটা বয়সে রাহুলের সুরকার হওয়ার ইচ্ছেকে আদৌ পাত্তা দেননি শচীনকর্তা। বরং বেজায় চিন্তায় পড়েছিলেন ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে। বালিগঞ্জ হাইস্কুলের বখাটে ছাত্র রাহুল ক্লাসে তো যেতোই না, স্কুল কেটে সিনেমায় যাওয়ার ব্যাপারে বন্ধুদের কাছে 'হিরো' হয়ে উঠছিলেন সাঁতার কাটতেন ভাল। আরও ভাল পারতেন সাইকেল চালাতে। ছেলের দুরন্তপনায় বিরক্ত এস ডি একবার ধমকেছিলেন, শোনো তুমি যা সাইকেল চালাও তার চেয়ে আমি ভাল টেনিস খেলতাম। এমন বেয়াড়া যুক্তিতে ঘাবড়ে না গিয়ে ১০ বছরের রাহুল বলেছিলেন, আর আমি যে মাউথ অর্গান বাজাতে পারি।

বড়কর্তা পঞ্চমের মাউথ অর্গান শুনেছিলেন। এবং ভুরু-টুরু কুঁচকে তাঁর মন্তব্য, এসব সুর তো তোমার নিজের নয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া। যদি সুরকার হতে চাও সত্যিকারের তবে তবলা শেখো। শুরু হয়ে গেল ব্রজেন বিশ্বাসের কাছে তবলা শেখা। ১৯৫৩-য় মুম্বই চলে আসেন রাহুল। তারপর তাঁর তালবাদ্যের গুরু হন শামতাপ্রসাদ এবং শচীনকর্তার ছেলেকে সরোদ শেখাতে শুরু করেন খোদ আলি আকবর খান। যে ছেলের গুরুভাগ্য এমন, ছোটবেলাতেই শুদ্ধ পঞ্চমে কাঁদতেন বলে যাঁর নাম দাদামণি অশোককুমার রেখেছিলেন পঞ্চম। তা সেই যে একদিন *'কিনারা'* বা *'অমরপ্রেম'*-এ অমন সুর দেবে এতে আশ্চর্য কী!

১৯৫৫য় গুরু দত্ত'র *'পিয়াসা'* ছবিতে প্রথম বাবার সঙ্গে কাজ করলেন পঞ্চম। ঠিক পরের বছরই গুরু দত্ত শুরু করলেন তাঁর নতুন ছবি *'রাজ'*। অবাক কাণ্ড, গুরু দত্ত সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন ১৭ বছরের পঞ্চমকে। বলা বাহুল্য, এ ঘটনায় শচীন দেববর্মণ খুশি হননি। আর ডি'র কপাল খারাপ, দুটি গান রেকর্ডিং হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায় ছবিটির কাজ। ফের কপাল খুললো মেহমুদের কল্যাণে। মেহমুদ *'ছোটে নবাব'* ছবিটির সুরকার হিসাবে শচীনকর্তাকে চেয়েছিলেন। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে মেহমুদকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এস ডি। নতুন পরিচালকের ছবি আমি করি না। মেহমুদও তেমনই। তবলা প্র্যাকটিস করছিলেন আর ডি। মুহূর্তের সিদ্ধান্ত, 'এস' কেটে 'আর' লিখে দিলেন কন্ট্রাক্টে। জন্ম নিলেন এক নতুন সুরকার—রাহুল দেববর্মণ। ১৯৫৮-য় মুক্তি পেয়েছিল *'ছোটে নবাব'*। বিরাট কিছু চলেনি। শুধু লতার *'ঘর আজা ঘির আয়ে বাদরা সাবরিয়া'* গানটি প্রশংসা পেয়েছিল। আর ডি'র মতে ওটা নাকি তাঁর অন্যতম সেরা কম্পোজিশন। ৬ বছর পর আর ডি দ্বিতীয় ছবি হাতে পান। *'চন্দন কা পালনা'* ও ফ্লপ। এর দুবছর পর বড় ব্রেক পেলেন। নাসির হুসেনের *'তিসরি মঞ্জিল'* শঙ্কর জয়কিষণকে না দিয়ে কেন তাঁকে দেওয়া হল এ ধাঁধাঁর উত্তর আর ডি'রও জানা নেই। কেবল জানা আছে হিন্দি ছবির সুরজগতের বাদশা জয়কিষণ *'তিসরি মঞ্জিলে'*র রেকর্ডিং-এ কীভাবে সাহায্য করেছিলেন। যে উন্মাদনায় সঙ্গীত দিয়ে পরবর্তী দশক জয় করেছিলেন

আশা ও রাহুল দেববর্মন

পঞ্চম দেখলেন, স্টুডিও থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন বাবা। হাঁটা-চলায় দৃপ্তভঙ্গি অদৃশ্য, নুয়ে পড়া চেহারা, যেন এক পরাজিত রাজপুত্র ফিরে যাচ্ছেন।

সমস্যাজনক

ডেলিকেট প্রশ্ন কবিতা

কৃষ্ণমূর্তি

আসলে এটা খুব ডেলিকেট প্রশ্ন জানেন তো। তবু বলছি শচীনদা ছিলেন তাঁর সময়ের প্রধান পুরুষ। আর পঞ্চমদা তাঁর নিজের সময়ের এক ব্যতিক্রমী সুরকার। শচীনদার গানেও মেলোডি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। যদিও তাতে দেশীয় টানটাই বেশি। আর পঞ্চমদার অর্কেস্ট্রাইজেশন এক কথায় অনবদ্য। ওঁর এই সুপার অর্কেস্ট্রাইজেশন অননুকরণীয়। ওটাকে পঞ্চমদা যেভাবে নিজস্ব স্টাইলের ভেতর এনে নিয়েছিলেন সেটা ওঁর মতো আর কেউ করে উঠতে পারেননি। যদি সেভাবে করতেনও, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেতেন সরাসরি। এতটাই নিজস্ব। আর যা নিজস্বতা প্রতিভা থেকেই আসে। ওটা নিয়ে জন্মাতে হয়। আমি পঞ্চমদার সুরে গান করেছিলাম '১৯৪২: আ লভ স্টোরি'-তে। এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়ে আছে তা আমার কাছে।

জিনিয়াস, জিনিয়াস দুজনেই

রাজেশ খন্না

কী বলব? দুজনেই জিনিয়াস। দুজনেরই ট্যালেন্ট ছিল অসাধারণ মাপের। বিচার করতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে আমার। কেননা এভাবে বিচার করার শক্তি আমার নেই। শচীনদার সুরের গানই হোক অথবা পঞ্চমের সুরের, আমার রোল ভীষণ লাইফফুল হয়ে উঠত। সে তো সব দর্শকরাই জানেন। আজও যদি আমি নস্টালজিক হয়ে পড়ি তখনও আমার পুরনো ছবিতে গাওয়া কিশোরদার গান মনে পড়ে যায়। কোনটা বলব? 'মেরে সপনোঁ কী রানি' 'গুন গুনা রহে হ্যায় ভাঁওরা' অথবা 'চিঙ্গারি কোই ভরকে' না, এ থেকেই তো বোঝা যায় দুজনেই ইতিহাস গড়ে দিয়েছেন। জিনিয়াস, জিনিয়াস দুজনেই।

চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ

গুলজার

অসামান্য প্রতিভা। দুজনেরই। চাঁদের এপিঠ আর ওপিঠ। কী করে তুলনা করব? একজনের ভিত থেকেই আর একজনের নির্মাণ। যোগ্য উত্তরসুরী পঞ্চম কোনও সন্দেহ নেই। আমার নিজের জীবনের প্রথমদিকে শচীন দেববর্মনের প্রভাব যেমন আমি পেয়েছি তেমনই তা থেকে পঞ্চমকে বুঝে নিতে পারার বোধও আমি অর্জন করেছি। পঞ্চমকে বুঝতে হলে তার আগে শচীনদাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। শচীনদাকে ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারলে তবেই পঞ্চমকে বোঝার কথা আসে। আমার পরিচালক জীবনের অনেকটা অংশই জুড়ে পঞ্চম। অসাধারণ সুর, তাল আর লয় জ্ঞান। আর সেটাকে ছবির চরিত্রোপযোগী করে তোলাতে ওর জুড়ি নেই। এই যে গুণ, এই যে সত্তা সেটা কিন্তু পরম্পরা থেকে পাওয়া। আর তারপরে যেটা করেছে ও, সেটা একেবারেই নিজের বোধ থেকে। লা-জবাব! দুজনেরই নিজস্বতা আর প্রতিভা নিয়ে তর্ক চলে না। ওঠাই উচিত নয়।
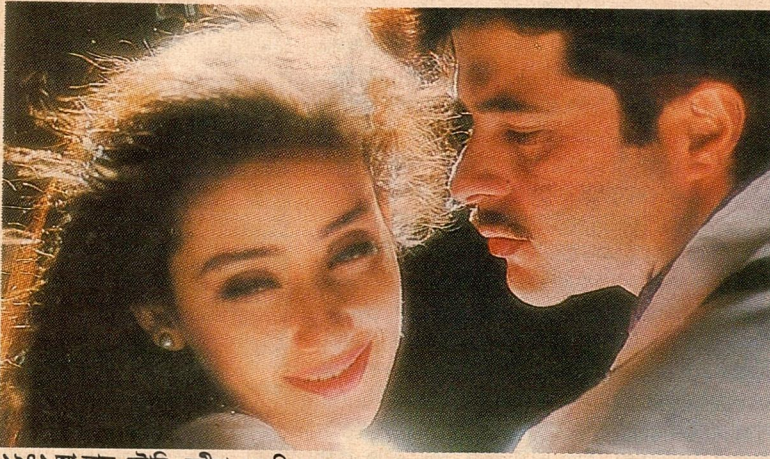
১৯৪২ আ লাভ স্টোরি : মনীষা ও অনিল কপূর

ছোটকর্তার সুর, বড়কর্তার ছায়া

আর ডি	এস ডি
তুনে ও রঙ্গিলা কৈসা জাদু কিয়া... (কুদরত)	হায় কি যে করি এ মন নিয়া...
যব ভি কোই কঙ্গনা বোলে... (সৌকিন)	নিটোল পায়ে রিমিক ঝিমিক...
খালি হাত শাম আয়ি হ্যায়... (ইজাজত)	আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে...
মিঠি বোল বোলে বোলে পায়েলিয়া... (কিনারা)	মধু বৃন্দাবনে...
ফুলকলি রে ফুলকলি বলতো এটা কোন গলি... (অনুসন্ধান)	সুন্দরি লো সুন্দরি...
সাগর কিনারে... (সাগর)	ঠাণ্ডি হাওয়ায়ে
অব তো শাওন বরসে (কিনারা)	কাঁদিব না ফাগুন গেলে

আর ডি, তার প্রথম বিস্ফোরণ—*'আজা আজা, ম্যায় হু প্যার তেরা।'*

প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়েছেন বড়কর্তা। হঠাৎ কানে এল কারা যেন তাঁকে দেখিয়ে বলছে, ওই দ্যাখ আর ডি বর্মণের বাবা। মর্নিংওয়াক মাথায় উঠল, বাড়ি ফিরেই স্ত্রী মীরার ওপর হম্বিতম্বি, কতবড় লায়েক হইসে পোলায়! কী এমন সুর করতাসে। অ্যাঁ? ছেলের নতুন রেকর্ড বাবার হাতে তুলে দিলেন গর্বিতা মা। সিনেমার নাম *'অমর প্রেম।' 'চিঙ্গারি কোই ভরকে', 'কুছতো লোগ কহেঙ্গে', 'ইয়ে কেয়া হুয়া'*—শুনতে শুনতে পঞ্চমের ওপর সব অভিমান ধুয়ে যাচ্ছিল ৬৫ বছরের বৃদ্ধ পিতার। এ ছেলে ৪ বছর বয়স থেকে নাড়া বেঁধেছে তাঁর কাছে, এ গুরুদক্ষিণা তো তাঁরই প্রাপ্য, কী অপূর্ব সুর করেছে পঞ্চম!

মিলির রেকর্ডিং এই প্যারালিটিক স্ট্রোক হয় শচীন দেববর্মণের। রেকর্ডিং শেষ করার দায়িত্ব নেন পঞ্চম। কিশোর যখন গাইছেন *'বড়ি শুনি শুনি হ্যায়'* তখন শুধু পঞ্চম নয়, স্টুডিওর সকলে কাজ করবে কী, কান্না চাপতে ব্যস্ত। যদিও এরপরও বেশ কিছুদিন বেঁচেছিলেন বড়কর্তা, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। সে শুধু নামেই বেঁচে থাকা, দীর্ঘস্থায়ী কোমায় তখন আচ্ছন্ন তিনি। পঞ্চম রোজ বাবাকে পুরনো দিনের গল্প শোনাতেন। ত্রিপুরার গল্প, কলকাতার বন্ধুদের নাম, আরও টুকরো হাজারও স্মৃতি। এরই মাঝে একদিন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয়। চিৎকার করে পঞ্চম এই খবরটুকু বাবাকে শুনিয়েছিলেন, বাবা ইস্টবেঙ্গল জিতে গেছে। শেষবারের মত চোখ খোলেন এস ডি। হ্যাঁ, নার্সিংহোমে থাকাকালীন ওই একবারই জ্ঞান ফিরেছিল তাঁর।

জীবন কে সফর মে...

পঞ্চম জানতেন, সত্তরের দশক তাঁরই দশক। কখনও বুকে ঘা দিচ্ছে এলভিস, কখনও বিটলস, আবার একইসঙ্গে গুলে খাচ্ছিলেন হেনরি ম্যানচিনির জ্যাজ কম্পোজিশন। শুধু সঙ্গীতই নয়, শিল্পকলার বহু ক্ষেত্রেই ঝড় তুলে দিয়ে গেছে ষাটের দশক। একটু দেরিতে হলেও সত্তরে সেই ঝড় তুলে দিলেন আর ডি। *'পিয়া তু-অব-তু আজা' (ক্যারাভান)* বা *'মেহবুবা'র (শোলে)* মতো গান কখনও শোনায়নি কেউ। একদিকে এ সমস্ত অসামান্য 'ক্যাবারে সঙ' অন্যদিকে *'চুরালিয়া হ্যায় তুমনে যো দিলকো' (ইয়াদো কি বরাত)* কিংবা *'তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোয়ি'র (আঁধি)* মতো রোমান্টিক গান—১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪ পঞ্চমের বিচরণ রাজার মতো। অমরপ্রেমের গান শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এস ডি। আরও নিশ্চিন্ত হতেন যদি শুনতেন গুলজার পঞ্চমের অনন্য যুগলবন্দি— *'মুসাফির হু ইয়ারো'* (পরিচয়), *'ও মাঝি রে' (খুশবু), 'নাম গুম জায়েগা' (কিনারা), 'তুম আগয়ে হো' (আঁধি)*—আরও এমন কত মনকাড়া গান।

'৮৪-তে এসে পথ হারালেন পঞ্চম। একটা ঘোরের মধ্যে এতদিন সুর করে চলছিলেন। হঠাৎ যেন ছন্দপতন ঘটল ছোটকর্তার। এত বেশি সিনেমা, এত বেশি গান আর পেরে ওঠা যাচ্ছিল না যে। এমন সময়ে বাবার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন পঞ্চম। মনে পড়েছে পুরনো এক ঘটনা। রাহুল ও রীতার ঘরে হঠাৎই হাজির সুরকার রোশন। বললেন, দ্যাখো কী কাণ্ড করেছি, সুচিত্রা সেনের *'মমতা'য়* সুর করতে করতে দাদার *'নওজোয়ান'* ছবির একটা গান আমার মতো করে নিয়েছি। পঞ্চম চমৎকৃত। *'ঠাণ্ডি হাওয়ায়ে'* গানটির মিটারে মাপ মতো নতুন গান বসিয়েছেন রোশন, দারুণ লাগছে শুনতে *'রহে না রহে হাম।'* রমেশ সিপ্পির *'সাগর'*-এ পুরনো খেলাটা খেললেন পঞ্চম। বড়কর্তা জিন্দাবাদ। ফের সুপার-ডুপার হিট—*'সাগর কিনারে।'* এই সময়টায় একটানা ভাল সুর করতে পারেননি আর ডি। প্রযোজকরাও তাঁকে ফেলে কপিকারদের পিছনে ছুটছে। যেদিন শুনলেন সুভাষ ঘাই *'রামলখন'* ছবি থেকে তাঁকে বাদ দিয়েছেন, ওইদিনই প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক। লন্ডনে বাইপাস সার্জারি হল। পরের পাঁচ বছর কাজ করতে পারেননি পঞ্চম।

শেষ ৪-৫ বছর এক অপরিসীম নিঃসঙ্গতায় কাটিয়েছেন পঞ্চম। মা'র আশ্রয়ের প্রশ্ন ওঠে না কেননা তিনি তখন উন্মাদ। মা-বাবার সঙ্গে মাত্র একবারই ত্রিপুরা বেড়াতে গিয়েছিল ছোট্ট পঞ্চম। তখন তার বয়স তিন। স্টেট থেকে বাবাকে বলা হয়েছিল, অর্থলোভী পেশাদার। অভিমান করে বাবা সবকিছু চিরকালের মতো ছেড়ে চলে আসেন। এসব ভাবলে মনখারাপ হত পঞ্চমের। বাবার গান ছাড়াও মনখারাপের সময় নিয়ম করে শুনতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাবা-মা'র ভীষণ প্রিয়। কিন্তু শচীনকর্তা কখনও দেখা করেননি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রের তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন হয়তো এই অভিমানে। শুধু সুরেরই নয়, বড়কর্তার কাছ থেকে এমন অভিমানেরও উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন ছোটকর্তা।

এই অভিমান নিয়েই হয়তো চলে যেতেন আর ডি, যদি বিধুবিনোদ চোপড়া *'১৯৪২ আ লাভ স্টোরি'* না করতেন। শেষবারের মতো হারমোনিয়াম টেনে নিয়েছিলেন। কোন দূর শৈশবের গন্ধমাখা সুর, বাবার হাত ধরে ভোরবেলা বেড়াতে যাওয়ার ভাল লাগা, তবলার শব্দ—সব যেন মিলেমিশে ছিল *'১৯৪২'*-এর সুরে। আসলে *'এক লেড়কি কো দেখা তো অ্যায়সা লাগা'র* সহজিয়া, মেঠো সুর তাঁর রক্তের সুর, যেন হারিয়ে যাওয়া এক ছেলেবেলার গান। বড়কর্তার কাছে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন, হার মানলেন ছোটকর্তা। যেন তাঁরই দেখানো রাস্তায় হাঁটলেন শেষবারের মতো। এই সেই পথ, আলোছায়া মাখা ধূসর লালমাটি রং, পথের দুধারে আজীবনের বসন্ত উৎসব। '৯৪-এর ৪ জানুয়ারি ভোররাতে নিঃসঙ্গ রাহুল ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে দেখলেন, বহু দূরে মিশে যাওয়া সে পথ ধরে দৃপ্তভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন, যেন বা কবেকার চেনা, এক সত্যিকারের রাজপুরুষ।